Political Science (H), SEM - IV, CC9

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় উদারনীতিবাদী তত্ত্ব

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

Raja N. L. Khan Women's College (Autonomous)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আঙ্গিনায় উদারনীতিবাদ একটি পুরাতন তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদী ধারা লক্ষ করা যায়। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই তত্ত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাম্প্রতিককালে ঠাণ্ডাযুদ্ধের পর এই তত্ত্বের জনপ্রিয়তা ও প্রচার পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদের তিনটি মূল ধারা লক্ষ করা যায়—

ক) উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ

খ) আদর্শবাদ

গ) উদার প্রতিষ্ঠানবাদ

ক) উদার আন্তর্জাতিকতাবাদ :

উদার আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে কান্ট ও বেন্থাম ছিলেন অগ্রণী। বেন্থাম বলেছেন যে, বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে আসলে কোন বিরোধ নেই। আন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে স্বার্থের সঙ্গতি আছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদার আন্তর্জাতিকতাবাদীরা শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সমর্থন করেছিলেন। কান্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন। তিনি সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে 'World Government' গঠনের কথা ভাবতেন। তিনি মনে করতেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য জাতি রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা দরকার। কান্ট মনে করতেন গণতান্ত্রিক ও নৈতিক নীতি ধারা পরিচালতি শাসন ব্যবস্থা জাতিরাষ্ট্রগুলিতে চালু হলে পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং শান্তির বাতারবণ গড়ে উঠবে।

উদারনীতিবাদীরা বিশ্বাস করেন অবাধ বাণিজ্যনীতি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটায় এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে। তারা মনে করেন পারস্পরিক

নির্ভরশীল বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠলে উন্নত অর্থনীতির পাশাপাশি অনুন্নত অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে।

খ) আদর্শবাদ (Idealism) :

উদারনীতিবাদের একটি ধারা হল আদর্শবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে আদর্শবাদের আবির্ভাব ঘটে। আদর্শবাদীরা ন্যায়নীতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনায় বিশ্বাসী ছিলেন। আদর্শবাদী ভাবনার অন্যতম স্থপতি কান্ট হলেও এই তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন উড্রো উইলসন। আদর্শবাদীরা পরাধীন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় রূপায়ণ, আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নিরস্ত্রীকরণের ধারণা সমর্থন করেন।

গ) উদার প্রতিষ্ঠানবাদ :

উদারবাদী আন্তর্জাতিক ভাবনার অন্যতম ধারা হল উদার প্রতিষ্ঠানবাদ। উদার প্রতিষ্ঠানবাদের সমর্থকগণ অতিজাতীয় সহযোগিতাকে সম্প্রসারিত করে বিশ্ব সমাজের বিবিধ সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। এদের মধ্যে Devid Mitrany ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি 'Integration Theory' এর একজন সমর্থক। তাঁর মতে অতি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিশ্বের অনেক সাধারণ সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়। তাঁর মূল ধারণা ছিল— Ramification। এক ক্ষেত্রের সহযোগিতা ধীরে ধীরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে। ঐক্যবদ্ধতার সূত্রে রাষ্ট্রগুলো যত ঐক্যবদ্ধ হবে ততই সহযোগিতার প্রকল্প থেকে সরে আসা তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। এই অতিজাতীয় সহযোগিতায় উদার প্রতিষ্ঠানবাদের মূল কথা। প্রতিষ্ঠানবাদীদের মতে আধুনিক যুগে জনকল্যাণের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলো রাষ্ট্রের পক্ষে সহায়ক ও অপরিহার্য।

Robert Keohane ও Joseph Nye আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, অতিজাতীয় সংংগঠন ও আন্তর্জাতিক সংগঠন বহুমুখী আদান প্রদানের সূত্রে কিভাবে আবদ্ধ সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। উদার প্রতিষ্ঠিানবাদীগণ মনে করেন যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস করে অতিজাতীয়তার প্রসারে সাহায্য করেছে। এই গতি ও প্রবণতা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

সমালোচনা :

উদারনীতিবাদী তত্ত্ব বহু সমালোচনার সম্মুখীন, যেমন—

১. সাম্প্রতিক কালে বালকান যুদ্ধের সময়ে উদারবাদী নীতি ও আদর্শ গভীর সংকটে পড়েছিল।

২. অনেকের মতে উদারবাদী মূল্যবোধ পশ্চিমী গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের অনুসারী। এই মূল্যবোধের বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার অ-পশ্চিমী সংস্কৃতির ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করবে।

৩. সমালোচকরা বলেন যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা— প্রভুত্ব (Hegemony) ও অধীনতার (Hegemony and Dependence) সম্পর্ক বিনষ্ট করে না। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৪. উদারবাদীদের অবাধ-বাণিজ্য নীতির সমালোচনা করা হয়। ঐ নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য অনেক সময় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

৫. উদারবাদীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে মডেল পেশ করেন তা সব দেশের সব অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে গ্রহণীয় নয়।

৬. উদারবাদীরা মনে করেন যে, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল থাকবে। অনেকে বলেন যে, বিশ্বে বহু অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অনুকূল নয়।

৭. অনেকের মতে অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে— একথা সর্বাংশে ঠিক নয়। রাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

Political Science (H), SEM - IV, CC9

নয়া-উদারবাদী তত্ত্ব (Neo-Liberal Theory)

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

Raja N. L. Khan Women's College (Autonomous)

বিগত শতাব্দীর ৮০-এর দশক থেকে রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে নয়া-উদারনীতিবাদের আবির্ভাব ঘটে। তার থেকে উদ্ভূত হয়েছে নয়া-উদারনীতিবাদের আন্তর্জাতিক ভাবনার। নয়া-উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক স্তরে বিবাদ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর জোর দেয়। এক্ষেত্রে নয়া-উদারনীতিবাদের মূল যুক্তি হল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতা প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থকে সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত রাখে। নয়া-উদারনীতিবাদের অভিমত হল রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বের মাধ্যমে স্বল্পকালীন কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে পারে কিন্তু যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্বের ফলে রাষ্ট্রগুলির দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ বিঘ্নিত হয়ে থাকে। নয়া-উদারনীতিবাদের এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে কেউ কেউ একে 'নয়া-উদার প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ' বা 'Neo-Liberal Institutionalism' বলে অভিহিত করেন।

নয়া-উদারনীতিবাদীরা মনে করেন রাষ্ট্র একমাত্র সিদ্ধান্তকারী একক নয়, পারস্পরিক নির্ভরতা, অন্যান্য যোগাযোগ সূত্র সব মিলিয়েই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিরাপত্তাই রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য নয়। গণতান্ত্রিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসার যুদ্ধের আশঙ্কা কমিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ও সার্বিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। নয়া-উদারনীতিবাদীরা বিশ্বাস করেন রাষ্ট্র দ্বন্দ্বমুখী নয়, বরং সহযোগিতায় তারা খুবই ইচ্ছুক, সহযোগিতার মাধ্যমেই সার্বিক কল্যাণ ও সুখ সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

নয়া-উদারবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় অর্থনৈতিক ভাবনা। এই ভাবনা অনুসারে অর্থনৈতিক উদারীকরণ, রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস করে বেসরকারি উদ্যোগের উপর গুরুত্ব প্রদান এবং অবাধ ও মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারির মরোক্কোর রাজধানী মারাকাসে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠিত হলে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতার নতুন পরিসর সৃষ্টি হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে মুক্ত অবাধ বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা দূর করবার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। নয়া-উদারনীতিবাদীরা বিশ্বাস করেন রাষ্ট্রীয় স্তরে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বাধাগুলি নির্মূল হলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বাতাবরণ প্রসারিত হবে। UNO, WTO সমেত অধিজাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির

পাশাপাশি নয়া-উদারনীতিবাদীরা রাষ্ট্রীয় স্তরে অ-রাষ্ট্রীয় কারকের ভূমিকাকে তাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার রক্ষা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে নয়া-উদারনীতিবাদের ভাবনায় বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে। এই সসম্যাগুলির মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের ভাবনার পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অ-রাষ্ট্রীয় কারকগুলি উদ্যোগের উপর নয়া-উদারনীতিবাদীরা জোর দিতে চান।

নয়া-উদারনীতিবাদীদের ভাবনায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির (যেমন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি) সংস্কারের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করেন। নয়া-উদারনীতিবাদীদের সংস্কারের প্রস্তাব তালিকা যেমন— সম শ্রমনীতি প্রবর্তনের বিষয়টি রয়েছে তেমনি কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর তাঁরা জোর দেন। নয়া-উদারনীতি আন্তর্জাতিক ভাবনায় বিশ্ব শান্তিকল্পে এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক স্তরের সহযোগিতাই একমাত্র পথ বলে বিবেচিত হয়।

Political Science (H), SEM - IV, CC9

মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxist Theory)

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

Raja N. L. Khan Women's College (Autonomous)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্ব বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষত্বের দাবী রাখে। তবে মার্কস বা এঙ্গেলস সামগ্রিকভাবে রাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে সুবিন্যস্ত আলোচনা করেন নি। বিপ্লব, শ্রেণি সংগ্রাম, পুঁজিবাদের ধ্বংস সাধন, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাদের লেখনী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে কিছু ধারণা তৈরি করেছে। পরবর্তীকালে তাদের অনুগামীরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মার্কসীয় ধারায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অনেকখানিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদকে কেন্দ্র করে। ধনতন্ত্রের বিকাশ আন্তর্জাতিক স্তরে কিভাবে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে, অসম উন্নয়ন সৃষ্টি করেছে, এবং উন্নত-অনুন্নত রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে— এই নিয়েই মূলত মার্কসীয় ধারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আলোচনার চেষ্টা করেছে। মার্কস দেখেছিলেন ধনতন্ত্র দেশীয় সীমানা পার হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এর বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া কী হবে, সে সম্পর্কে বিশেষভাবে তিনি কিছু বলেননি। মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর লেখা Communist Manifesto (1848) থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ্য : আন্তর্জাতিক বাজারকে শোষণের মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণি পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই উৎপাদন ও ভগ্যপণ্যকে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র দিতে সক্ষম হয়েছে। এর, কিছু পরেই তাঁরা বলেছেন, সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতির মধ্য দিয়ে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে সহজ করে সমস্ত রাষ্ট্রকে— বিলুপ্ত হবার যন্ত্রণার সামনে নিয়ে এসে— বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছে। নিঃসন্দেহে লেনিন বা বুখারিন পরবর্তীকালে যে সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেছিলেন, তার বীজ নিহিত ছিল সম্ভবতঃ এই উক্তির মধ্যে।

লেনিন এবং বুখারিন উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ খুঁজে বের করা আর এই অনুসন্ধিৎসার ফসল হল সাম্রাজ্যবাদীতত্ত্ব। লেনিন তাঁর 'Imperialism : The Highest Stage of Capitalism' (1916) গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও তার পরিণতিকে ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, এই সময়ে পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর চাইতে মূলধনের রপ্তানী (export of capital) অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত,

মূলধন এবং উৎপাদন কেন্দ্রীভূত ও উন্নত হয়ে ওঠার ফলে একচেটিয়া কারবারী হয়ে ওঠে মুখ্য উৎপাদক ব্যবস্থা। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্ক মূলধন (Bank Capital) ও শিল্পজাত মূলধনের (Industrial Capital) একত্রিত হয়ে যে মহাজনী পুঁজি (Finance Capital) সৃষ্টি হয় তা তৈরি করে এক ধরনের সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র বা oligarchy। চতুর্থত, ধনতান্ত্রিকদের নিয়ে যে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া অধিকার (monopoly) প্রতিষ্ঠিত হয়, তা সারা পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই বিভাজন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিকদের মধ্যে আগামীদিনের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের বীজ বপন করা হয়। বুখারিন মনে করতেন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি তাদের সীমানা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার কারণ ছিল : কাঁচামাল আহরণ, উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় এবং মূলধনের বিনিয়োগ। আর এরই পরিণতিতে দেখা দিয়েছিল সংঘাত, ধনতান্ত্রিক বিস্তৃতি ও সাম্রাজ্যবাদ। আর এর ফলে দেখা দিল আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন যার একদিকে রইল কয়েকটি সুদৃঢ়, সংগঠিত অর্থনৈতিক গোষ্ঠী— আর তার বিপরীতে রইল কৃষিভিত্তিক বা আধা-কৃষিভিত্তিক অনুন্নত কিছু প্রত্যন্ত রাষ্ট্র।

ষাটের দশকের শেষদিকে প্রকাশিত আন্দ্রে গুন্দর ফ্রাংকের (Andre Gunder Frank)– 'অনুন্নয়নের উন্নয়ন' (Development of Under Development) তত্ত্ব বা সত্তরের দশকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত ইমানুয়েল ওয়ালারাস্টাইনের (Immanuel Wallerstain)– বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব (World System Theory) বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল মার্কসীয় ধারার মাধ্যমে। ফ্র্যাংক মূলত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিলি ও ব্রাজিলের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের সমস্যা আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, লাটিন আমেরিকার অনুন্নয়নের পেছনে মূলত তিনটি স্বতঃবিরোধিতা রয়েছে : উন্নত দেশগুলি কর্তৃক অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের স্বত্বনিরসন অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা; সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান/ মুখ্য কেন্দ্র (metropolitan) এবং প্রান্তিক উপগ্রহের (peripheral satellites) মধ্যে সম্পূর্ণ মেরুভবন (polarisation); এবং এই স্বতঃবিরোধিতা ও মেরুভবনের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্বজুড়ে বিকাশ ও পরিবর্ধন। তাঁর মতে সমগ্র আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হল ''a whole chain of metropolises and satellites, which runs from the world metropolis down to the hacienda or rural merchant who are satellites of the local commercial metropolitan centre but who in their turn has their peasants as satellites.'' এ যেন এক বিশাল শৃঙ্খল— যার সূচনা হয়েছে পৃথিবীর প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রে; নেমে এসেছে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের বণিকদের স্তর পর্যন্ত। এই গ্রামীণ বণিকেরা যেমন স্থানীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্রের উপগ্রহ, তেমনি এরা আবার গ্রামের কৃষকদের নিজস্ব উপগ্রহে পরিণত করে। প্রায় অনুরূপ বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায় ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বে— এই বক্তব্য অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী অসম ও বিকৃত উন্নয়নের পেছনে আছে বিশ্বব্যাপী

ধনতন্ত্রের বিকাশ ও তার অভ্যন্তরীণ শ্রেণিসংঘাত। এরই ফলে পৃথিবী বিভক্ত হয়েছিল তিনটি ভাগে : 'কেন্দ্র' (Core), প্রত্যন্ত (periphery) এবং আধা-প্রত্যন্ত (semiperiphery) অঞ্চলে— আর, এই অর্থনৈতিক বিভাজনের মানদণ্ডই কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা। এখানে উল্লেখ্য 'কেন্দ্র' বলতে বোঝায় অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলিকে, প্রত্যন্ত অঞ্চল হোল অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত অঞ্চলসমূহ; এবং আধা-প্রত্যন্ত অঞ্চল এই দুইয়ে মাঝামাঝি দেশগুলো। এই ধারার অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ওয়ালটার রড্‌নি (Walter Rodney), বা সমীর আমিন (Samir Amin) প্রায় একই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। রডনি মনে করেন, আফ্রিকা তথা তাবৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ক্রমান্বয়ে অনুন্নত হয়ে পড়েছে, কারণ, উন্নত দেশগুলি তাদের শোষণের ধারা ক্রমশই তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করে তুলছে। আমিন গুরুত্ব দিয়েছেন অনুন্নয়নের উন্নয়ন, বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ওপর এবং কেন্দ্রস্থিত ধনতন্ত্রীদের দ্বারা প্রান্তিক রাষ্ট্রে সর্বহারাদের শোষণের ওপর। তার মতে, ''A development that is not merely development of underdevelopment will therefore be national, popular-democratic, and socialist, by virtue of the world project of which it forms part.''

সমালোচনা :

মার্কসীয় তত্ত্বকে নানা দিক থেকে সমালোচনা করা হয়। যেমন—

প্রথমত : পরনির্ভরশীলতা তত্ত্ব বা বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব সম্পর্কে গোঁড়া মার্কসবাদীরাই প্রশ্ন তোলেন। আন্তর্জাতিক স্তরে আন্তঃশ্রেণি সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের কথা যারা বলেন তারা কি প্রান্তিক রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পদ্ধতিসমূহ ও তাদের গ্রন্থন (articulation) অস্বীকার করেন না?

দ্বিতীয়ত : একথা অনস্বীকার্য যে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিবর্তন ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি তথা বিশ্বধনতন্ত্রের সঙ্গে একীকরণের বিশ্লেষণ করা সম্ভব একমাত্র বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের প্রসারের আলোচনার মাধ্যমে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের বিকাশ সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির একই রকম হয়েছে, সেকথা বলা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত : মার্কসীয় তত্ত্বে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা বাস্তবে আজও কার্যকর হয় নি। সমালোচকদের মতে শ্রেণিগত দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ অসম্ভব।

চতুর্থত : মার্কসীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধের কারণ হিসাবে মূলত অর্থনৈতিক উপাদানকেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থনীতি ছাড়াও

ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক বা শাসকের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসাবে কাজ করে।

উপরোক্ত সমালোচনা থাকা সত্বেও একথা বলা যায় যে মার্কসবাদীরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। যার প্রাসঙ্গিকতা আজও বিদ্যমান। বিশ্বে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্যের প্রেক্ষিতে শ্রেণিভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চা প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে বলে চিন্তাবিদরা মনে করেন।

Political Science (H), SEM - IV, CC9

নারীবাদী তত্ত্ব (Feminist Theory)

Prof. Md Reja Ahammad

Dept. of Political Science

Raja N. L. Khan Women's College (Autonomous)

বিগত শতাব্দীর ৯০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় নারীবাদ এক বিশেষ স্থান দখল করেছে। সূচনালগ্ন থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্য লক্ষ করা গিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যাতে নারীদের কোনো স্থান ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে সমস্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়ে এসেছে তার মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক কূটনীতি, ক্ষমতার ভারসাম্য, যুদ্ধ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী এবং আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি। এই প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব ছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙিনায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির কোনো সুযোগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ছিল না বললেই চলে। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাবেকী তত্ত্বগুলি পুরুষতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারীবাদী চিন্তাবিদদের মতে রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতির সমস্ত সংগঠনই তৈরি হয়েছে পুরুষদের নেতৃত্বে। তাঁদের মতে রাষ্ট্র এবং রাজার অর্থনীতির সমস্তটাই চলছে পুরুষদের দ্বারা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি নারীদের ভূমিকা বা অংশগ্রহণকে কোনোভাবেই মেনে নেয়নি। নারীবাদী চিন্তাবিদরা তাই পুরোনো লিঙ্গ সম্পর্কের সমালোচনা করে বিশ্ব রাজনীতিকে পুনর্নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নারীবাদী চিন্তাবিদরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পুনর্নির্মাণ করে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে চান।

রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আবশ্যিক ছিল। ৫০-৬০-এর দশকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নারীবাদী সংগঠনগুলি 'নারী উন্নয়ন'-এর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির উপর চাপসৃষ্টি করতে থাকে। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ নারী উন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

৭০-এর দশকের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাবনাতে মানবাধিকার, পরিবেশ সংক্রান্ত ইস্যু উঠে আসার সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারীবাদের উৎপত্তির একটা সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। নারীবাদীরা মানবাধিকারের ইস্যুকে সরাসরি নারীদের সমস্যার

সাথে যুক্ত করে দেখতে চান। তাঁদের মতে মানবাধিকারহীনতা আসলে পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্য থেকে ওঠে আসা এবং নারীদের নির্যাতনের ইস্যু। স্বভাবতই তাঁরা মনে করেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিনির্মাণের মাধ্যমেই মানবাধিকারহীনতা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে।

৮০-এর দশক থেকে সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় সাধারণ ভাবে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চায় বিশেষভাবে নারীবাদী আলোচনা প্রাধান্য পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৭৫-১৯৮৪ এই দশ বছর বিশ্ব নারী দশক হিসেবে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করলে বিশ্বজুড়ে নারীদের সম্পর্কে নানা তথ্য এবং তাদের জীবনের নানা সমস্যা উঠে আসে। এর মধ্যে মূলত তিনটি ক্ষেত্র সম্পর্কে নারীর অবস্থান স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই তিনটি ক্ষেত্র হল—

ক) উন্নয়নে নারীর অবস্থান।

খ) রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ।

গ) সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা।

ইউরোপের কয়েকটি দেশ ছাড়া পৃথিবী জুড়েই উল্লেখিত তিনটি ক্ষেত্রে নারীদের দূরবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। মূলত এই সময় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে নারীদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে নানা কর্মসূচি একদিকে যেমন গৃহীত হতে থাকে অন্য দিকে তেমনি আন্তর্জাতিক সংগঠন, সংস্থা এবং বিভিন্ন পরিচালন ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নানান সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি নারীবাদী চর্চার অঙ্গ হিসাবে পুরুষতান্ত্রিক প্রধান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চার প্রভুত্ব ছেদ করে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে।

নারীবাদীরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিসরকে রাজনৈতিক কূটনীতি থেকে বের করে এনে বৃহত্তম পরিসরে স্থাপন করতে চান। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারীবাদী তাত্ত্বিকদের চর্চায় মানবাধিকার, পরিবেশগত বিষয়, মা ও শিশুর উন্নয়ন, দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সমেত নানান ইস্যু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :—

১. International Relations Today - Aneek Chatterjee.

২. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি— শক্তি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়।

৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক— বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক— গৌতম কুমার বসু।